بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ জুলাই, ২০২০ মোতাবেক ০৩ ওফা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

গত খুতবা থেকে হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.)'র স্মৃতিচারণ চলছিল। বদরের যুদ্ধে বিশ্বস্ততার অঙ্গীকার পালনের একটি ঘটনা, গত খুতবায়ও যার উল্লেখ হয়েছিল, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, এটি একটি প্রকৃতিগত বিষয় যে, যেখানে ভালোবাসা থাকে সেখানে কেউই চায় না, আমার প্রিয়ের কোন কষ্ট হোক। আর তার প্রেমাস্পদ যুদ্ধে যাক– এটি কেউই পছন্দ করে না। বরং প্রেমাস্পদকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়। একইভাবে সাহাবীরাও এটি পছন্দ করতেন না যে, মহানবী (সা.) যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন। সাহাবীরা এটি অপছন্দ করতেন না যে, আমরা কেন যুদ্ধে যাব, বরং মহানবী (সা.)-এর যুদ্ধে যাওয়া তাদের অপছন্দ ছিল, আর এটি তাদের স্বভাবজ আকাঙ্ক্ষা ছিল, যা প্রত্যেক প্রেমিকের তার প্রেমাস্পদের প্রতি থেকে থাকে। এছাড়া আমরা দেখি এবং ইতিহাস থেকেও একথার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) যখন বদর প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছেন তখন তিনি সাহাবীদের বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, কাফেলার সাথে নয় বরং আমাদের মোকাবিলা হবে মক্কার সেনাবাহিনীর সাথে। এরপর তিনি (সা.) তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং বলেন, তোমাদের মতামত বল। জ্যেষ্ঠ সাহাবীরা তাঁর (সা.) একথা শুনে পালাক্রমে দণ্ডায়মান হয়ে আত্মনিবেদনমূলক জোরালো বক্তব্য প্রদান করেন এবং বলেন, আমরা সব ধরনের কুরবানীর জন্য প্রস্তুত আছি। একজন উঠে বক্তব্য দিয়ে বসে পড়তেন, এরপর আরেকজন উঠে পরামর্শ দিয়ে আসন গ্রহণ করতেন। মোটকথা যারাই দাঁড়িয়েছেন তারা একথাই বলেছেন যে, আমাদের খোদা যদি আমাদের নির্দেশ দেন তাহলে আমরা অবশ্যই যুদ্ধ করব। কিন্তু কেউ পরামর্শ দিয়ে বসার পর মহানবী (সা.) পুনরায় বলতেন, আমাকে পরামর্শ দাও। আর এর কারণ ছিল, তখন পর্যন্ত যেসব সাহাবী একে একে দাঁড়িয়ে বক্তব্য ও পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা সবাই ছিলেন মুহাজেরদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (সা.) যখন বার বার এটি বলছিলেন যে, আমাকে পরামর্শ দেওয়া হোক তখন অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মু'আয (রা.) তাঁর (সা.) অভিপ্রায় অনুধাবন করে আনসারদের পক্ষ থেকে দাঁড়িয়ে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আপনার সমীপে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনি এটিই বলছেন যে, আমাকে পরামর্শ দাও– এথেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আপনি আনসারদের মতামত জানতে চাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের নীরব থাকার কারণ হলো, আমরা যদি যুদ্ধ সমর্থন করি তাহলে মুহাজেররা হয়ত ভাববে, এরা আমাদের স্বজাতি এবং আমাদের ভাইদের সাথে যুদ্ধ করতে এবং তাদেরকে হত্যা করতে চায়। এরপর তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! সম্ভবত আপনি আকাবার বয়আতের সেই চুক্তির কথা ভাবছেন যাতে আমাদের পক্ষ হতে এই শর্ত উপস্থাপন করা হয়েছিল যে, শত্রুরা যদি মদিনার ওপর আক্রমণ করে তাহলে আমরা তাদের প্রতিরোধ করব কিন্তু মদিনার বাহিরে গিয়ে যদি যুদ্ধ

করতে হয় তাহলে আমরা এর দায়িত্ব নেব না। মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ, (ঠিক বলেছ)। সা'দ বিন মু'আয (রা.) নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা যখন আপনাকে মদিনায় নিয়ে এসেছিলাম তখন আমরা আপনার সুউচ্চ মাকাম ও পদমর্যাদা সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞাত ছিলাম না। এখন তো আমরা স্বচক্ষে আপনার সত্যতা দেখতে পেয়েছি। এখন আমাদের দৃষ্টিতে সেই চুক্তির কোন মূল্য নেই। অর্থাৎ আকাবার বয়আতের সময় যে চুক্তি হয়েছিল তা জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সাধারণ চুক্তি ছিল। এখন আমরা যা দেখেছি আর আমাদের আধ্যাত্মিকতার যে চোখ উন্মুক্ত হয়েছে– এরপর তো সেটির কোন মূল্যই নেই। তাই আপনি যেখানে যাবেন আমরাও আপনার সাথে আছি। আর খোদার কসম! আপনি যদি আমাদেরকে সমুদ্রে ঝাঁপ দেয়ার নির্দেশ দেন তাহলে আমরা ঝাঁপ দিব আর আমাদের মধ্য থেকে একজনও পিছু হটবে না। হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা আপনার সামনেও লড়ব এবং পেছনেও লড়ব, আপনার ডানেও লড়ব এবং বামেও লড়ব, আর আমাদের লাশ পদদলিত না করা পর্যন্ত শত্রুরা আপনার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারবে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সূরা রা'দ-এর ১২নম্বর আয়াত পাঠ করেন, আয়াতটি হল,

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

অর্থাৎ তাঁর জন্য তার অগ্রে এবং পশ্চাতে বিচরণকারী নিরাপত্তাপ্রহরী নিযুক্ত রয়েছে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যতের পুরো যুগ এই নিরাপত্তার প্রমাণ বহন করে যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছিলেন যে, অগ্রে ও পশ্চাতে আমরা নিরাপত্তাপ্রহরী নিযুক্ত করে রেখেছি। অতএব মক্কা মুয়ায্‌যামায় তাঁর (সা.) সুরক্ষা ফিরিশতারাই করত। নতুবা এত বেশি শত্রু পরিবেষ্টিত জায়গায় অবস্থান করার পরও তাঁর প্রাণ কীভাবে সুরক্ষিত থাকতে পারে। হ্যাঁ, মদিনায় আগমনের পর উভয় প্রকার নিরাপত্তা তিনি লাভ করেন, অর্থাৎ ঊর্ধ্বলোকের ফিরিশতাদের নিরাপত্তা আর জাগতিক ফিরিশতা অর্থাৎ সাহাবীদের নিরাপত্তা। বদরের যুদ্ধ এই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক নিরাপত্তা বিধানের একটি অতি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় গমন করেছিলেন তখন তিনি (সা.) মদিনাবাসীদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি যদি মদিনার বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করেন তাহলে মদিনাবাসীরা তাঁর সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকবে না। বদরের যুদ্ধে তিনি আনসার এবং মুহাজেরদের কাছে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ আহ্বান করেন। মুহাজেররা বারংবার সামনে এগিয়ে যুদ্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তাদের কথা শুনে পুনরায় বলতেন, হে লোক সকল! পরামর্শ দাও। এতে একজন আনসারী সা'দ বিন মুআয বলেন, হুযূর কি আমাদের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছেন? মহানবী (সা.) বলেন, হ্যাঁ। তিনি (রা.) বলেন, নিঃসন্দেহে আমরা আপনার সাথে চুক্তি করেছিলাম যে, যদি বাহিরে গিয়ে যুদ্ধ করতে হয় তাহলে আমরা আপনার সঙ্গ দিতে বাধ্য থাকব না। কিন্তু সেটি ভিন্ন যুগ ছিল। এখন আমরা যেহেতু নিশ্চিত হয়েছি যে, আপনি খোদা তা'লার সত্য রসূল, তাই এখন আর এই পরামর্শের প্রয়োজন নেই। আপনি যদি আমাদের আদেশ দেন তাহলে আমরা আমাদের ঘোড়া নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমরা মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মতো একথা বলব না যে, তুমি আর তোমার প্রভু গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে আছি। বরং আমরা আপনার ডানে, বামে, সম্মুখে ও পিছনে থেকে যুদ্ধ করব। আর আমাদের লাশ পদদলিত না করা পর্যন্ত শত্রুরা কিছুতেই আপনার কাছে পৌঁছতে পারবে না। তিনি (রা.) বলেন, এই নিষ্ঠাবানরাও আমার মতে সেসব

مُعَقِّبَاتٌ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, অর্থাৎ সেসব নিরাপত্তাপ্রহরীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তা বিধানের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন।

একজন সাহাবী বলেন, আমি মহানবী (সা.) এর সাথে ১৩টি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছি, কিন্তু আমার হৃদয়ে বহুবার এই বাসনার উদয় হয়েছে যে, আমি যদি এসব যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পরিবর্তে সেই বাক্য উচ্চারণ করার সৌভাগ্য পেতাম যা সা'দ বিন মুআয-এর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, অর্থাৎ স্বীয় নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা সম্বলিত যে অঙ্গীকার তিনি করেছিলেন (সেটির কথা বলছেন)। বদরের যুদ্ধে হযরত সা'দ বিন মুআয-এর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উল্লেখ করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন,

মুসলিম সেনাবাহিনী যে স্থানে শিবির স্থাপন করেছিল যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি উত্তম কোন স্থান ছিল না। এতে হুব্বাব বিন মুনযের তাঁর (সা.) কাছে নিবেদন করেন যে, আপনি কি খোদার কোন এলহামের ভিত্তিতে এই স্থানটিকে পছন্দ করেছেন নাকি কেবল সামরিক কৌশল হিসেবে তা অবলম্বন করেছেন? মহানবী (সা.) বলেন, এ সম্পর্কে কোন ঐশী নির্দেশ নেই, তুমি কোন পরমর্শ দিতে চাইলে দিতে পার। হুব্বাব (রা.) নিবদেন করেন, তাহলে আমার মতে রণকৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে এ জায়গা উপযুক্ত নয়। বরং সামনে অগ্রসর হয়ে কুরাইশদের নিকটবর্তী যে জলাধার রয়েছে সেটিকে দখল করে নেয়া উচিত। এ জলাধার সম্পর্কে আমি ভালোভাবে অবগত আছি, এর পানি ভালো এবং সাধারণত যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। মহানবী (সা.) তার এ প্রস্তাব পছন্দ করেন। এছাড়া কুরাইশরাও যেহেতু তখনও পর্যন্ত টিলার বিপরীত দিকে তাবু গেঁড়ে অবস্থান করছিল আর এ জলাধার খালি ছিল, তাই মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে এই জালাধারের দখল নিয়ে নেয়। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেমনটি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তখন সেই জলাধারেও বেশি পানি ছিল না আর মুসলামনরা পানির স্বল্পতা অনুভব করছিল। এছাড়া এ (সমস্যা)ও ছিল যে, উপত্যকার যে দিকটাতে মুসলমানরা ছিল সেই জায়গাটা ততটা ভালো ছিল না। কেননা এদিকে অনেক বেশি বালু ছিল যার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো যেত না।

জায়গা নির্বাচনের পর অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর প্রস্তাবে সাহাবীরা যুদ্ধক্ষেত্রের একাংশে মহানবী (সা.)-এর জন্য একটি ছাউনীর মতো বানিয়ে দেন এবং হযরত সা'দ (রা.) সেই ছাউনীর পাশে মহানবী (সা.)-এর বাহন বেধে দিয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এই ছাউনীতে অবস্থান গ্রহণ করুন আর আমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করছি। আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাদেরকে বিজয় দান করেন আর আমাদের প্রত্যাশাও তা-ই, তাহলে সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র। কিন্তু আল্লাহ্ না করুন! যদি ভিন্ন কিছু ঘটে তাহলে আপনি আপনার বাহনে আরোহন করে যেভাবেই হোক মদিনায় পৌঁছে যাবেন। সেই তাবুর পাশেই তিনি (রা.) একটি উন্নত জাতের উট বাহন হিসেবে বেঁধে রাখেন। এরপর তিনি নিবদেন করেন, আপনি মদিনায় চলে যাবেন আর সেখানে আমাদের এমন সব ভাই-বন্ধু রয়েছে যারা আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ক্ষেত্রে আমাদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু তারা যেহেতু বুঝতে পারে নি যে, এই অভিযান যুদ্ধে রূপ নিবে, তাই তারা আমাদের সাথে আসে নি, অন্যথায় তারা কখনোই পিছনে থাকত না। কিন্তু তারা যখন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হবে তখন আপনার নিরাপত্তার খাতিরে তারা তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। এটি ছিল সা'দ (রা.)-এর আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার দৃষ্টান্ত যা সর্বাবস্থায় প্রশংসাযোগ্য ছিল। অন্যথায় খোদার রসূল কি কখনো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন

করে! মহানবী (সা.) তো যুদ্ধক্ষেত্রে সর্বাগ্রে থাকতেন। যেমনটি আমরা হুনায়েনের যুদ্ধের সময় দেখতে পাই যে, ১২ হাজার সৈনিক পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, কিন্তু একত্ববাদের প্রাণ [মুহাম্মদ (সা.)] স্বীয় অবস্থানে অনড় ছিলেন। যাহোক সা'দ (রা.)-এর কথানুযায়ী ছাউনী প্রস্তুত করা হয়। এরপর সা'দ (রা.) এবং অন্যান্য কতিপয় আনসার সাহাবী এর চারপাশে প্রহরা দেয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) সেই ছাউনীতেই রাত্রিযাপন করেন। মহানবী (সা.) সারারাত কাকুতিমিনতি করে আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করেন। আর লেখা আছে যে, গোটা সেনাদলের মাঝে একমাত্র মহানবী (সা.)-ই সারারাত জেগে ছিলেন, বাকি সবাই পর্যায়ক্রমে ঘুমিয়ে নিয়েছেন।

উহুদের যুদ্ধের সময় শুক্রবার রাতে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) মসজিদে নববীতে অস্ত্রে-সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দরজায় প্রহরা দেন। উহুদের যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন ঘোড়ায় আরোহন করেন এবং ধনুক কাধে তুলে আর বর্শা হাতে নিয়ে মদিনা থেকে যাত্রা করেন তখন উভয় সা'দ, অর্থাৎ হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.) তাঁর (সা.) সামনে সামনে দৌড়াচ্ছিলেন। তারা উভয়েই বর্ম পরিহিত ছিলেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) উহুদের যুদ্ধের কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন–

মহানবী (সা.) আসরের নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর বড় একটি দল সাথে নিয়ে মদিনা থেকে বের হন। অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতারা অর্থাৎ সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.) তাঁর (সা.) বাহনের সামনে ধীর গতিতে দৌড়াচ্ছিলেন আর বাকি সাহাবীগণ তাঁর (সা.) ডানে, বামে ও পিছনে হাঁটছিলেন। উহুদের যুদ্ধ শেষে মহানবী (সা.) যখন মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ ঘোড়া থেকে নামেন, তখন তিনি (সা.) হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন উবাদার (রা.) সহায়তায় নিজ ঘরে প্রবেশ করেন। মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এর মায়ের কীরূপ অনুরাগ বা ভালোবাসা ছিল– তার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,

উহুদের যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনকালে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর বাহনের লাগাম ধরে গর্বের সাথে হাঁটছিলেন। উক্ত যুদ্ধে তার (রা.) ভাইও শহীদ হয়েছিলেন। মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছলে হযরত সা'দ তার মা'কে আসতে দেখে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর মায়ের বয়স তখন প্রায় আশি-বিরাশি বছর ছিল। দৃষ্টিশক্তি ছিল না বললেই চলে, খুবই ক্ষীণ দেখতে পেতেন। রোদ-ছায়ার পার্থক্য বুঝতেও অনেক কষ্ট হতো। মদিনায় এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, মহানবী (সা.)-কে শহীদ করা হয়েছে। এই সংবাদ শুনে সেই বৃদ্ধা মহিলা নড়বড়ে পায়ে মদিনার বাইরে বের হচ্ছিলেন। সা'দ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার বাহন দাঁড় করাও। অর্থাৎ কাছাকাছি পৌঁছলে বলেন, তোমার মা আসছেন যেহেতু তাই তার কাছে গিয়ে আমার বাহন দাঁড় করাও। মহানবী (সা.) সেই বৃদ্ধার কাছে এলে বৃদ্ধা নিজ সন্তানদের বিষয়ে কোন সংবাদ জানতে চান নি। যা জানতে চেয়েছেন তা হলো, মহানবী (সা.) কোথায়? হযরত সা'দ উত্তর দেন যে, আপনার সামনেই আছেন। বৃদ্ধা উপরের দিকে তাকান এবং তার ক্ষীণ দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মহানবী (সা.) বলেন, বিবি! আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি

যে, আপনার যুবক ছেলে এই যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছে। বৃদ্ধ বয়সে কেউ এমন খবর শুনলে তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে যায়, কিন্তু সেই বৃদ্ধা কতটা অনুরাগ মিশ্রিত উত্তর দেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি এ কেমন কথা বলছেন? আমি তো আপনার সুরক্ষার জন্য দুশ্চিন্তা করছিলাম! হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা শেষে তবলীগের দায়িত্বের প্রতি আহমদী মহিলাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, এরাই সেই সকল মহিলা– যারা ইসলাম প্রচার এবং তবলীগের ক্ষেত্রে পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন এবং এরাই সেসব মহিলা– যাদের কুরবানীতে ইসলামী বিশ্ব গর্ববোধ করে। বর্তমান যুগে তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারী মহিলা যারা রয়েছ, তোমরাও এই দাবি করে থাক যে, তোমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছ। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হলেন মহানবী (সা.)-এর আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তোমরাও মহিলা সাহাবীদের আধ্যাত্মিক প্রতিচ্ছবি সাব্যস্ত হও। কিন্তু তোমরা সঠিকভাবে বল যে, তোমাদের মাঝে ধর্মের প্রতি সেই গভীর অনুরাগ আছে কি যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল? তোমাদের মাঝে সেই নূর বা জ্যোতি বিদ্যমান আছে কি যা মহিলা সাহাবীদের মাঝে ছিল? তোমাদের সন্তানরা কি সেরূপ পুণ্যবান যেমনটা মহিলা সাহাবীদের (সন্তানরা) ছিল? যদি তোমরা গভীর অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করে দেখ, তাহলে তোমরা নিজেদেরকে মহিলা সাহাবীদের তুলনায় অনেক পিছনে দেখতে পাবে। মহিলা সাহাবীরা যেসব কুরবানী বা আত্মত্যাগ করেছেন, আজ পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠে তার তুলনা পাওয়া যায় না। নিজেদের জীবন বাজি রেখে তারা যে কুরবানী দিয়েছেন তা আল্লাহ্ তা'লার এতই পছন্দ হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা অতি দ্রুত তাদেরকে সফলতা দান করেছেন আর অপরাপর জাতিসমূহ যে কাজ শত শত বছরেও করতে পারে নি, পুরুষ এবং মহিলা সাহাবীগণ সেসব কাজ গুটিকতক বছরেই করে দেখিয়েছেন। এখানে যেহেতু তিনি আহমদী মহিলাদের সম্বোধন করে কথা বলছিলেন, তাই তাদের উল্লেখ রয়েছে, অন্যথায় অগণিত ক্ষেত্রে সর্বদা খলীফাগণ বলে এসেছেন, আমিও বহুবার বলে এসেছি যে, আমাদের (আহমদী) পুরুষদেরও সেসব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করতে হবে, তবেই আমরা যে দাবি করি এবং যেই দাবি নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছি যে, সারা পৃথিবীতে ইসলামের বাণী পৌঁছাব এবং বিশ্ববাসীকে ইসলামের পতাকাতলে নিয়ে আসব– তার ওপর আমল করতে পারব। আর সাহাবীরা আমাদের সামনে যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন আমাদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কর্ম যদি তদনুযায়ী হয় কেবল তবেই তা সম্ভব।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, খ্রিষ্টান বিশ্ব মরিয়ম মগদেলিনী এবং তার মহিলা সঙ্গীদের সেই সাহসিকতায় আনন্দিত যে, শত্রুর দৃষ্টির অগোচরে প্রাতঃকালে তারা মসীহ্‌র কবরে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি তাদেরকে বলছি যে, আস আর আমার প্রেমাস্পদের নিষ্ঠাবান ও নিবেদিতপ্রাণ সাহাবীদের দেখ যে, কী পরিস্থিতিতে তারা তাঁর (সা.) সঙ্গ দিয়েছেন এবং কেমন পরিস্থিতিতে তারা তওহীদ তথা একত্ববাদের পতাকাকে সমুন্নত করেছেন। এ ধরনের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার আরেকটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায়, অপর এক স্থলে হযরত সা'দ বিন মুআযের মায়ের উক্ত দৃষ্টান্ত আবার তুলে ধরেন যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন শহীদদের দাফন করে মদিনায় ফিরে আসেন তখন মহিলা ও শিশু-কিশোররা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য শহরের বাহিরে বেরিয়ে আসে। মদিনার সম্ভ্রান্ত নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) মহানবী (সা.)-এর উটনীর লাগাম ধরে রেখেছিলেন আর গর্বের সাথে সম্মুখ পানে ছুটে যাচ্ছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন তিনি বিশ্ববাসীকে একথা বলছেন যে, তোমরা দেখেছ! আমরা

মহানবী (সা.)-কে নিরাপদে তাঁর ঘরে ফিরিয়ে এনেছি। শহরের দ্বারপ্রান্তে তিনি তার বৃদ্ধা মাকে আসতে দেখেন যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছিল। উহুদের যুদ্ধে তার এক পুত্র আমর বিন মুআযও শহীদ হয়েছিলেন। তাকে দেখে সা'দ বিন মুআয (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার মা আসছেন। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজিসহ আসুন। বৃদ্ধা সামনে অগ্রসর হয়ে নিজের দুর্বল ও ক্ষীণ দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা দেখার জন্য এদিক সেদিক তাকাতে থাকেন। অবশেষে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারা সনাক্ত করে খুবই আনন্দিত হন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, মা! তোমার ছেলের শাহাদাতে আমি তোমার প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন করছি। এতে সেই পুণ্যবতী মহিলা বলেন, হুযূর! আমি যখন আপনাকে অক্ষত অবস্থায় দেখতে পেয়েছি, মনে করুন আমি সব দুঃখকে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি। বিপদাপদকে ভুনা করে খেয়ে ফেলা (আরবের) এক অদ্ভুত বাগধারা। আর এটি ভালোবাসার কতই না সুগভীর আবেগ-উচ্ছাসের বহিঃপ্রকাশ করছে। দুঃখ-যাতনা মানুষকে খেয়ে ফেলে। সেই মহিলা, যার বৃদ্ধ বয়সে তার বার্ধক্যের লাঠি ভেঙে গেছে, কী বীরত্বের সাথে বলছে যে, ছেলে-হারানোর দুঃখ আমাকে কী কাবু করবে, মুহাম্মদ (সা.) যেহেতু জীবিত আছেন তাই আমি সেই দুঃখ-যাতনাকে নিঃশেষ করে দিব। আমার ছেলের মৃত্যু আমাকে শেষ করবে না, বরং মহানবী (সা.)-এর জন্য সে নিজের প্রাণ দিয়েছে– এই বিষয়টি আমার শক্তি বৃদ্ধির কারণ হবে, আমার সামর্থ্য বাড়িয়ে তোলার কারণ হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আনসারদের প্রশংসা করতে গিয়ে এবং তাদের জন্য দোয়া করতে গিয়ে বলেন, হে আনসারগণ, আমার প্রাণ তোমাদের জন্য উৎসর্গীকৃত, তোমরা কতই না সওয়াব বা পুণ্য অর্জন করেছ।

কা'ব বিন আশরাফের বিদ্রোহ, ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছড়ানো, এমনকি মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করার অপরাধে মহানবী (সা.) তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি প্রদানের যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন সে ক্ষেত্রেও আনসার গোত্রের নেতা হিসাবে হযরত সা'দ বিন মুআযের পরামর্শকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ এই শাস্তির বাস্তবায়ন এবং কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার বিস্তারিত বিবরণ কিছুদিন পূর্বে দু'জন সাহাবীর স্মৃতিচারণে বর্ণনা করেছি। তবুও এই ঘটনার কিছু অংশ, অর্থাৎ যতটুকু হযরত সা'দ বিন মুআযের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তা এখানেও বর্ণনা করছি। আর এখন যা বর্ণনা করব এর কিছু আমি সংগ্রহ করেছি আর কিছু উদ্ধৃতি সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তক থেকেই নেয়া হয়েছে।

মহানবী (সা.) যখন হিজরত করে মদিনায় আসেন তখন কা'ব বিন আশরাফ অন্যান্য ইহুদিদের সাথে একত্রিত হয়ে সেই চুক্তিতে অংশগ্রহণ করে যা মহানবী (সা.) এবং ইহুদিদের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও যৌথ-প্রতিরক্ষার বিষয়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কা'বের মনে বিদ্বেষ ও শত্রুতার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে এবং সে গোপন কূটচাল ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করে দেয়। অতএব লিখিত আছে যে, কা'ব প্রতি বছর ইহুদি আলেম ও মাশায়েখদেরকে অনেক দান-দক্ষিণা দিত। একদিন সে সেসব আলেমকে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদির আলোকে মহানবী (সা.) সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তোমাদের কী মনে হয়, তিনি (সা.) কি সত্যবাদী? তারা বলে, বাহ্যত তো তাকে সেই নবী-ই মনে হচ্ছে যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেয়া হয়েছিল এবং যার কথা আমাদের শিক্ষামালায় রয়েছে। কা'ব যেহেতু

মহানবী (সা.) ও ইসলামের খুবই কট্টর বিরোধী ছিল, তাই এই উত্তর শুনে সে চরমভাবে ক্ষেপে যায় এবং তাদেরকে 'নিতান্ত অপদার্থ' বলে গালাগাল করে সেখান থেকে তাড়িয়ে দেয়; আর তাদেরকে যে দক্ষিণা দিত, তা-ও তাদেরকে দেয় নি। দক্ষিণা যখন বন্ধ হয়ে যায়, অর্থাৎ তাদেরকে যে ভাতা দেয়া হতো তা যখন বন্ধ হয়ে যায়, টাকার লোভ তো মৌলভীরা এখনও ছাড়তে পারে না, তাদের অবস্থাও তা-ই ছিল, তখন তারা কিছুদিন পর কা'বের কাছে গিয়ে বলে, আমরা পুনরায় গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখেছি– আসলে মুহাম্মদ (সা.) সেই নবী নন, যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। তাদের এই কথায় খুশি হয়ে সে (অর্থাৎ কা'ব) তাদের ভাতা পুনর্বহাল করে; অর্থাৎ যে দান-দক্ষিণা সে দিতো, তা দিয়ে দেয়।

যাহোক ইহুদি আলেমদেরকে পুনরায় নিজের সাঙ্গপাঙ্গ করে নেয়াটা সাধারণ একটি বিষয় ছিল, কিন্তু ভয়ঙ্কর বিষয় যেটি ছিল তা হলো, বদরের যুদ্ধের পর সে এমন পন্থা অবলম্বন করে যা অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ ও নৈরাজ্যকর ছিল এবং যার ফলে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। বদরের যুদ্ধে মুসলমানরা যখন অসাধারণ এক জয় লাভ করে এবং কুরাইশদের অধিকাংশ নেতা নিহত হয়, তখন সে অর্থাৎ কা'ব বুঝতে পারে যে, এই নতুন ধর্ম এত সহজে ধ্বংস হবে বলে মনে হচ্ছে না। প্রারম্ভে আমাদের ধারণা ছিল যে, এটি এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু না, এখন মনে হচ্ছে এটি বিস্তার লাভ করবে। সুতরাং বদরের যুদ্ধের পর ইসলামকে নিশ্চিহ্ন ও ধ্বংস করার জন্য সে সমস্ত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালায় এবং কোন পন্থা বাদ রাখে নি। সে দৃঢ় সংকল্প করে যে, আমি ইসলামকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করেই ছাড়ব। আর আমি যেমনটি বলেছি, বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের পর সে ক্রোধ এবং রাগে আরো বেশি ফেটে পড়ে। আর এই ক্রোধের কারণে যখন সে সংকল্পবদ্ধ হয় যে, আমি ইসলামকে ধ্বংস করেই ছাড়ব, তখন তাৎক্ষণিকভাবে সফরের প্রস্তুতি নিয়ে সে মক্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। সেখানে পৌঁছে সে নিজের বাকপটুতা এবং বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে কুরাইশদের হৃদয়ের জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢেলে দেয়, অর্থাৎ তাদেরকে আরো উস্কে দেয়। তাদের হৃদয়ে মুসলমানদের রক্তের অতৃপ্ত পিপাসা সৃষ্টি করে যে, তোমরা হেরে গেছ, তোমাদের নেতাদেরকে তারা হত্যা করেছে আর তোমরা নির্বিকার বসে আছ, যাও এবং প্রতিশোধ নাও। তারা এতে প্ররোচিত হয়ে যায়। সে তার বক্তৃতা ও বিদ্রোহী কবিতার মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে প্রতিশোধের অনল ও শত্রুতায় পূর্ণ করে দেয়। কা'ব-এর প্ররোচনায় তাদের আবেগ-অনুভূতিতে যখন চরম পর্যায়ের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় তখন সে তাদেরকে কা'বা গৃহের প্রাঙ্গনে নিয়ে গিয়ে কা'বার পর্দা তাদের প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে তাদের কাছ থেকে শপথ গ্রহণ করে যে, ইসলাম ও ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে ধরাপৃষ্ঠ থেকে ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত আমরা শান্তিতে বিশ্রাম নিব না। সে কেবল মক্কায় এরূপ উত্তেজনাকর পরিবেশ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয় নি, বরং এই হতভাগা আরবের অন্যান্য গোত্র অভিমুখে যাত্রা করে এবং প্রত্যেক জাতির নিকট গিয়ে প্রতিটি গোত্রে ঘুরে ঘুরে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মানুষকে উত্তেজিত করতে থাকে। এরপর মদিনায় ফিরে এসে পুনরায় নিজের ইসলাম বিরোধী কার্যক্রমে গতি সঞ্চার করে এবং অমুসলিমদের কাছে, বিশেষকরে ইহুদিদের কাছে তার উত্তেজক পঙ্‌ক্তিতে অশ্লীল ও নোংরা ভাষায় মুসলমান নারীদের কথা উল্লেখ করত। আর শুধু বিরোধিতার আগুন প্রজ্বলিত করেই সে ক্ষান্ত হয় নি, বরং পরিশেষে সে মহানবী (সা.)-কে হত্যা করারও অপচষ্টা বরং ষড়যন্ত্র করেছে। আর কোন এক দাওয়াতের বাহানায় সে মহানবী (স.) কে তার বাড়িতে ডাকে এবং কয়েকজন ইহুদি যুবককে দিয়ে তাঁকে (সা.) হত্যার ষড়যন্ত্র করে। খোদার কৃপায়

যথাসময়ে তিনি (সা.) এ বিষয়টি অবগত হন, খোদা তা'লা তাঁকে (সা.) এ বিষয়টি জানিয়ে দেন আর এভাবে তার ষড়যন্ত্র বিফল হয়। বিষয়টি যখন এতদূর গড়ায় এবং ক্বাবের বিরুদ্ধে অঙ্গীকার ভঙ্গ, (যে অঙ্গীকার করেছিল তা সে ভঙ্গ করে), রাষ্ট্রদ্রোহিতা (যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত ছিল তার বিদ্রোহ), যুদ্ধের উসকানি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল বক্তব্য এবং হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তখন মহানবী (স.), যিনি সেই বহুজাতিক সন্ধিচুক্তির ভিত্তিতে, যা তাঁর মদিনায় আগমনের পর মদিনাবাসীর সাথে সম্পাদিত হয়েছিল, মদিনা রাষ্ট্রের রাষ্টপ্রধান এবং প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি (সা.) এ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে, কাব বিন আশরাফ তার কৃতকর্মের কারণে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধী। আর নিজের কতিপয় সাহাবীকে তিনি (সা.) এই নির্দেশ প্রদান করেন যেন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং প্রজ্ঞার দাবি অনুযায়ী তিনি (সা.) এ নির্দেশনা প্রদান করেন যে, কাবকে যেন প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দেয়া না হয়, বরং কয়েকজন মিলে যেন সুযোগ বুঝে নীরবে-নিভৃতে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। আর এ দায়িত্ব তিনি অওস গোত্রের একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন এবং তাকে জোরালো নির্দেশ দিয়ে বলেন, তোমরা যে কৌশলই অবলম্বন কর না কেন অওস গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয-এর সাথে অবশ্যই পরামর্শ করে নিবে। অতএব মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) সা'দ বিন মুআয এর পরামর্শক্রমে আবু নায়লা ও আরো দু'তিনজন সাহাবীকে নিজের সাথে নেন এবং কাবের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ কার্যকর করেন। তাকে হত্যার জন্য যে কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল তার বিশদ বিবরণ, যেমনটি আমি বলেছি, কতিপয় সাহাবীর স্মৃতিচারণের সময় পূর্বেই উপস্থাপন করেছি।

যাহোক, যে কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিল সে অনুসারে রাতের বেলায় তাকে ঘর থেকে বের করে হত্যা করা হয়েছিল। সকাল বেলা তার হত্যার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় আর ইহুদিরা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায়। আর পরবর্তী দিন সকালে ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করে যে, আমাদের সর্দার কাব বিন আশরাফকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন,

তোমরা কি জানো না সে কী কী অপরাধের অপরাধী? সে নিহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার অপরাধ ছিল আর সেই অপরাধের শাস্তি সে পেয়েছে। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে সংক্ষেপে কাবের অঙ্গীকার ভঙ্গ, যুদ্ধের উসকানি, নৈরাজ্য সৃষ্টি, অশ্লীল বক্তব্য এবং হত্যার ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অপকর্মের কথা স্মরণ করান। তখন তারা ভয় পেয়ে নীরব হয়ে যায়। তারা সবাই জানত যে, সে এসব অপরাধ করছিল। এরপর মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন, তোমাদের উচিত ভবিষ্যতের জন্য হলেও শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ জীবনযাপন করা এবং শত্রুতা ও নৈরাজ্যের বীজ বপন না করা। অতএব ইহুদিদের সম্মতিক্রমে ভবিষ্যতের জন্য একটি নতুন অঙ্গিকারনামা বা চুক্তি লেখা হয় আর ইহুদিরা নতুনভাবে মুসলমানদের সাথে শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ জীবনযাপনের এবং ফিতনা ও নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার করে। অর্থাৎ নতুন একটি চুক্তিপত্র লিখা হয়। ইতিহাসে কোথাও এর উল্লেখ নেই যে, এরপর ইহুদিরা কখনো কাব বিন আশরাফের হত্যার কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করেছে। কেননা তারা মনে মনে এটি অনুভব করত যে, কাব তার অপরাধের শাস্তি পেয়েছে আর সে এই শাস্তি পাওয়ারই যোগ্য ছিল যা তাকে দেয়া হয়েছে। মহানবী (সা.)ও কখনো অস্বীকার করেন নি যে, আমরা এটি করি নি অথবা এ বিষয়ে আমরা

কিছুই জানি না, বরং তিনি (সা.) তখন তার সব অপরাধের কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া এই বিষয়টিও সুস্পষ্ট যে, এটি মহানবী (সা.)-এর সিদ্ধান্ত ছিল এবং তিনি (সা.) সরকারপ্রধান ছিলেন। আর মদিনার দুজন নেতার মতামতও এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা মুসলমান ছিলেন অর্থাৎ সা'দ বিন মাআয এবং আরেকজন।

ইহুদি গোত্র বনু নযীর প্রতারণার মাধ্যমে মহানবী (সা.)এর ওপর পাথর ফেলে তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল। আল্লাহ্ তা'লা ওহীর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে (এই ষড়যন্ত্রের) সংবাদ অবহিত করেন। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে সেই গোত্রের কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি (সা.) তাৎক্ষণিকভাবে মদিনায় ফিরে আসেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) সেই গোত্রকে অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। ৪র্থ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে মহানবী (সা.)-কে বাধ্য হয়ে বনু নযীরের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে হয়। এর ফলে অবশেষে এই গোত্র মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়। বনু নযীরের যুদ্ধের গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-কে ডেকে বলেন, তোমার জাতিকে আমার কাছে ডেকে আন। হযরত সাবেত নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! শুধু কি খাযরাজকে (ডেকে আনব)? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন, সমস্ত আনসারকে ডেকে আন, তারা যে গোত্রেরই হোক না কেন। অতএব তিনি (রা.) অওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মহানবী (সা.)-এর নিকট ডেকে আনেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) তাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তিনি (সা.) আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রসংশা ও গুণকীর্তন করেন। এরপর মুহাজেরদের ওপর আনসারদের অনুগ্রহ অর্থাৎ আনসারদের দ্বারা মুহাজেরদেরকে নিজেদের ঘরে আশ্রয় দেয়া এবং মুহাজেরদেরকে নিজেদের প্রাণের ওপর প্রাধান্য দেয়ার উল্লেখ করেন যে, আনসাররা মুহাজেরদের প্রতি কী কী ভাবে অনুগ্রহ করেছেন! এরপর তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সম্মত থাকলে আমি বনু নযীর থেকে অর্জিত গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তোমাদের ও মুহাজেরদের মাঝে ভাগ করে দিব আর মুহাজেররা পূর্বের মতোই তোমাদের বাড়িঘরে বসবাস করবে। গনিমতের যে সম্পদ পাওয়া গেছে তা দুই অংশে বণ্টন হবে। কিন্তু শর্ত হলো যেভাবে তারা পূর্বে তোমাদের বাড়িঘরে বসবাস করছে এবং তোমরা তাদের সাথে যে অনুগ্রহের আচরণ করছ তা করতে থাক। এই সম্পদ সমভাবে বণ্টন করে নাও। আর দ্বিতীয়ত উপায় হলো, তোমরা সম্মত থাকলে এই সম্পদ আমি মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব। আমি আনসারদের কিছুই না দিয়ে প্রাপ্ত সম্পদের সবটুকুই মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিব। তাহলে তারা তোমাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন তারা আর তোমাদের বাড়িতে থাকবে না, নিজেরা নিজেদের ব্যবস্থা করে নিবে, কেননা এখন তারা সম্পদ পেয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) পরস্পর পরামর্শ করার পর দুজনে মিলে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! এই সম্পদ আপনি মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দিন এবং তারা আরো বলেন, কিন্তু তারা যথারীতি আমাদের ঘরেই বসবাস করবে। সম্পদ গ্রহণের পর তারা আমাদের ঘর থেকে বের হয়ে যাবে– এটি আমরা চাই না। তারা যেভাবে আমাদের ঘরে বসবাস করছে এবং যেভাবে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত আছে, তা সেভাবেই অটুট থাকবে। সেইসাথে আনসাররা নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা এতে সম্মত আছি এবং (আপনার সিদ্ধান্ত) আমাদের জন্য শিরোধার্য। আপনি যদি মুহাজেরদের মাঝে এ সম্পদের সবটুকুই বিতরণ করে দেন তাতে আমাদের কোন অনুযোগ

থাকবে না। একথা শুনে মহানবী (সা.) বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি আনসারদের প্রতি দয়া কর এবং তাদের পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি অনুগ্রহ কর। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সা.) গনিমতের মাল বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুহাজেরদের মাঝে বণ্টন করে দেন আর দু'জন অভাবী ব্যক্তি ছাড়া আনসারদের মাঝে আর কাউকে তা থেকে কিছুই দেন নি। তারা হলেন যথাক্রমে হযরত সাহাল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং আবু দুজানা (রা.)। মহানবী (সা.) হযরদ সা'দ বিন মু'আয (রা.)-কে আবু হুকায়েক ইহুদির তরবারি দান করেন। ইহুদিদের মাঝে এই তরবারিটির খুব প্রসিদ্ধি ছিল। অর্থাৎ এরপর হযরত মুআয (রা.)-কে একটি তরবারি দিয়েছিলেন।

যখন ইফকের ঘটনা ঘটে এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর প্রতি জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় তখন মহানবী (সা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) এবং তাঁদের পরিবারকে অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর মুনাফিকদের এই নোংরা আচরণের কথা মহানবী (সা.) সেযুগেই কিছু দিন পর এক উপলক্ষ্যে সাহাবীদের সামনে উল্লেখ করেন তখনও হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) এক নিঃস্বার্থ ও নিবেদিতপ্রাণ সেবক হওয়ার প্রমাণ রাখেন। এই ঘটনাটি হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যার বিশদ বিবরণ আমি ইতিপূর্বে একজন সাহাবী হযরত মিসতা (রা.)-এর স্মৃতিচারণের সময় উল্লেখ করেছি। তথাপি হযরত সা'দ (রা.) সম্পর্কিত বিবরণটুকু আমি এখানে তুলে ধরছি। যেমনটি আমি বলেছি, সে যুগে মহানবী (সা.) একদিন ঘর থেকে বাহিরে এসে সাহাবীদের একত্রিত করে বলেন, এমন কেউ কি আছে যে আমাকে সেই ব্যক্তি হতে রক্ষা করবে যে আমাকে কষ্ট দিয়েছে? এর দ্বারা তিনি (সা.) আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.), যিনি অওস গোত্রের নেতা ছিলেন, দাঁড়িয়ে যান এবং নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (সা.)! সেই ব্যক্তি যদি আমাদের মধ্য থেকে হয়ে থাকে তাহলে আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত আছি। আর সে যদি খাজরায গোত্রেরও হয় তবুও আমরা তাকে হত্যা করতে প্রস্তুত রয়েছি।

খন্দকের যুদ্ধের সময় আবু সুফিয়ান বনু নযীর গোত্রের নেতা হুঈ'কে বনু কুরায়যার নেতা কা'ব বিন আসওয়াদের কাছে এই বার্তা দিয়ে প্রেরণ করে যে, মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ কর। সে তা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে সবুজ বাগানের প্রলোভন দেখিয়ে এবং মুসলমানদের ধ্বংসের নিশ্চয়তা দেয়ার মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন না করতে তাকে শুধু রাজি-ই করায় নি বরং তাকে মক্কার কাফেরদের সাহায্যকারী হওয়ার ব্যাপারেও সম্মত করে নেয়।

এই ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন-

মহানবী (সা.) যখন বনু কুরায়যার ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে অবগত হন, তখন তিনি (সা.) প্রথমে দুই-তিন বার গোপনে যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে পরিবেশ পরিস্থিতি অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেন। আর এরপর তিনি (সা.) আনুষ্ঠানিকভাবে অওস ও খাযরাজ গোত্রের নেতা সা'দ বিন মুআয (রা.) ও সা'দ বিন উবাদা (রা.) এবং অন্যান্য কতিপয় সাহবীকে একটি প্রতিনিধি দল হিসেবে বনু কুরায়যার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন আর তাদেরকে এই তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দেন যে, কোন উদ্বেগজনক সংবাদ থাকলে ফিরে এসে তা প্রকাশ্যে বলবে না বরং ইশারা-ইঙ্গিতের আশ্রয় নিবে যেন মানুষের মাঝে অস্থিরতা সৃষ্টি না হয়। তারা যখন বনু কুরায়যার বসতিস্থলে পৌঁছেন এবং তাদের নেতা কা'ব বিন

আসওয়াদ-এর কাছে যান তখন সেই দুর্ভাগা অত্যন্ত দাম্ভিকতার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং এই দুই সা'দ অর্থাৎ, সা'দ বিন মুআয (রা.) এবং সা'দ বিন উবাদা (রা.)-এর পক্ষ থেকে চুক্তির কথা উল্লেখ হতেই সে এবং তার গোত্রের লোকেরা উত্তেজিত হয়ে বলে, যাও! মুহাম্মদ (সা.) এবং আমাদের মাঝে কোন চুক্তি সম্পাদিত হয় নি। আমরা কোন চুক্তি করি নি। এ কথা শুনে সাহাবীদের এই প্রতিনিধি দল ফিরে আসে এবং সা'দ বিন মুআয (রা.) ও সা'দ বিন উবাদা (রা.) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে যথাযথভাবে মহানবী (সা.)-কে উক্ত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন।

যাহোক তখন তাদের এ আচরণ মুসলমানদের জন্য অনেক বড় ধাক্কা ছিল। মক্কার কাফেররা চতুর্দিক থেকে মদিনা অবরুদ্ধ করে রেখেছিল। মক্কার কাফেরদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের অবস্থা বিরাজ করার কারণে এ গোত্রের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নেয়াও সম্ভব ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ শেষে শহরে ফিরে আসার পর মহানবী (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা দিব্যদর্শনের মাধ্যমে বনু কুরায়যার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের শাস্তি প্রদানের কথা বলেন। এ আদেশ আসে যে, তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। তখন মহানবী (সা.) সার্বজনীন ঘোষণা জারি করে বলেন, বনু কুরায়যার দুর্গের উদ্দেশে রওয়ানা হয়ে যাও এবং আসর নামায সেখানে গিয়েই যেন পড়া হয়। আর তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সাহাবীদের একটি দলের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে অগ্রে প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধের বিস্তারিত বর্ণনা কিছুটা দীর্ঘ, যেখানে পরিশেষে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.)-এরও ভূমিকা রয়েছে। এখন সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতে এর বিস্তারিত বিরবণ তুলে ধরব।